ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 76-84
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.011

প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা : আসামের ছোটগল্পে

নয়ন দে, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ভারত*
E mail: nirnoydey.7399@gmail.com

Received: 20.09.2024; Accepted: 28.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The presence of nature in world literature is particularly important. The relationship between nature and humans is as intimate as that between literature and nature. Therefore, we see that writer, enchanted by the beauty of nature and absorbed in joy, have adeptly expressed the innermost thoughts of their hearts in their literary creations. The reflection of nature is evident in poetry, stories, novels, plays, and various branches of literature. In different branches of literature, nature emerges both as a symbol of beauty and abundance and as a representation of hardship and adversity. It is also deeply intertwined with human life and emotions. Thus, the characters in literature have felt a sense of unity with nature. In the case of Bengali literature, the presence of nature is not just an environmental backdrop, but a reflection of the human soul. Especially in Bengali short stories, nature sometimes serves as the backdrop of the story and at other times reflects the feelings of the characters. The diversity and beauty of nature play a significant role in the artistic depiction of stories. On one hand, natural scenes, the monsoon season, or the silence of winter – these natural imageries create the atmosphere of the narrative. On the other hand, contemporary short stories have placed importance on environmental issues and the thought of nature's protection.

In light of the above title, we will examine the short stories of Assam's storytellers and see how much nature contributes to the construction of the story's backdrop. We will explore how the storyteller has reinterpreted the relationship between humans and nature, and to what extent the theme of nature's protection has captured the conscious mindset of the storytellers. The various elements of Assam's natural beauty have been brought to light through the storyteller's perspective. At the same time, the narrative also reflects how much of nature's beauty and diversity is being destroyed due to modern development. Furthermore, nature is becoming a symbol of various emotions within the human mind in these stories. Based on these themes, there will be an attempt to analyze the underlying meaning and significance of the stories.

বিশ্ব সাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যতটা নিবিড়, তেমনি সাহিত্যের সঙ্গেও ততটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই দেখা যায়, সাহিত্যিকরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে, জগৎ প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধ হয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্থলের কথা সুচারুরূপে তুলে ধরেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং বিভিন্ন শাখায় প্রকৃতির প্রতিফলন দৃশ্যমান। সাহিত্যের নানা শাখায় প্রকৃতি কখনও সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য, কখনও দুর্গম-দুর্দশার প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে। আবার মানব জীবন এবং অনুভূতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। তাই তো সাহিত্যের মানব চরিত্র প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপস্থিতি শুধুমাত্র পরিবেশগত চিত্রকল্প নয়, বরং মানব আত্মার প্রতিফলন। বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পে প্রকৃতি কখনো গল্পের পটভূমি, আবার কখনো চরিত্রের অনুভূতির প্রতিফলন। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য গল্পের শিল্পিত চিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য, বর্ষার আষাঢ়, অথবা শীতের নিস্তব্ধতা—এসব প্রকৃতির চিত্রকল্প কাহিনির আবহ তৈরি করেছে। তেমনি অন্যদিকে বর্তমান সময়ে ছোটগল্পে পরিবেশগত সমস্যা এবং প্রকৃতির সুরক্ষা বিষয়ক চিন্তা ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছে।

আমরা উক্ত শিরোনামের নিরিখে আসামের গল্পকারের ছোটগল্প আলোচনায় দেখব যে, গল্পের প্রেক্ষাপট নির্মাণে প্রকৃতির উপস্থিতি কতটুকু অবদান রেখেছে। গল্পকারের গল্প মানব-প্রকৃতির সম্পর্ককে কীভাবে পুনর্ব্যাখ্যা করেছে। এবং প্রকৃতির সুরক্ষার কথা গল্পকারদের সচেতন মানসিকতায় কতটুকু ধরা পড়েছে। গল্পকারের দৃষ্টিতে যেমন আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা উপাদান উঠে এসেছে। তেমনি আধুনিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই ছবিও উঠে এসেছে, তাছাড়া প্রকৃতি গল্পের মানব মনের নানা অনুভূতির প্রতীক হয়ে উঠছে। এসব বিষয়ের নিরিখে গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার প্রয়াস থাকবে।

এক

আসামের বাংলা ছোটগল্পকারেরা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাই, শুধু প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ দেখেই ক্ষান্ত হননি। তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আল্পনা এঁকেছেন। আবার প্রকৃতির প্রতি সংঘটিত অনিয়ন্ত্রিত ধ্বংস তাণ্ডব সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমালোচনা করেছেন, তাঁদের সাহিত্য কৃতির মাধ্যমে। যেমন, কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পাণ্ডে, স্বপ্না ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, পরিতোষ তালুকদার প্রমুখের গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গভীরতা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। ঝুমুর পাণ্ডে-এর 'জল খাবেন বনদুর্গা' গল্পের প্রেক্ষাপট প্রকৃতি। চা বাগান ও বরাক উপত্যকার গ্রামের সৌন্দর্যের কথা উঠে এসেছে তাঁর এই গল্পে। অন্যদিকে পরিতোষ তালুকদার-এর 'সীমান্তের ওপারে' গল্পে প্রকৃতির চিত্রায়ন মানব জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তপোধীর ভট্টাচার্যের 'বাড়িটা' গল্প ও স্বপ্না ভট্টাচার্যের 'বাস্তুহীন' গল্পে প্রকৃতি কখনও জীবনের সৌন্দর্য, কখনও আবার বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে উঠেছে। আমরা গল্প আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সেই সুরকে ও ঐশ্বর্যকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

দুই

বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকরা প্রকৃতিকে পরম মমতায় এবং লালিত্যে অনুভূতিশীল কল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় প্রকৃতির রূপকে তুলে ধরা হয়েছে নানা রূপে ও ভাবে। চর্যাপদের অনেক পদেই প্রকৃতি ও পরিবেশের উল্লেখ আমরা পাই,

"উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলীগুহাড়া তোহৌরি
ণি অ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী।।
ণা ণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুন্ডল বজ্রধারী।।"[১]

মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃতি মানব মনের বিচিত্র অনুভূতির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিরা প্রকৃতিকে তাদের অনেক পদে অঙ্কিত করেছেন--

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ডিলোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে ঘন সাজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে।।"[২] (জ্ঞানদাস)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ও মিলনের কাহিনি তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতার স্বরূপ খুঁজেছেন এইভাবে,-

"প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।"[৩]

বাংলা সাহিত্যে লেখকদের কলমে 'প্রকৃতি' একটি বড় অংশ হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের লেখকরা স্থান-কাল নির্বিশেষে প্রকৃতির সঙ্গে এক ধরণের আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছে পরম কোমলতা ও কমনীয়তার সাথে। তাঁদের রচনায় প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অটুট শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিদের কবিতায় প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় রূপ আমরা দেখতে পাই। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পথের পাঁচালি', 'আরণ্যক', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'জননী', 'পদ্মানদীর মাঝি', বনফুল-এর 'ডানা', অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর 'তিতাস একটি নদীর নাম', অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর 'নির্বাস' ইত্যাদি উপন্যাসে ও তাঁদের গল্পেও প্রকৃতির ছবি বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে।

তিন

আসামের মহিলা গল্পকার ঝুমুর পাণ্ডের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে আমরা দেখতে পাই নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্যরকম নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর **'জল খাবেন বনদুর্গা'** গল্পের প্রধান চরিত্র বনদুর্গা-র মধ্যে এই সম্পর্কের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে আমরা দেখি যে প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে শুয়ে

আছেন অসুস্থ বনদুর্গা, দুচোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরছে। আর তার চোখে জলের সঙ্গে শিশিরের অপূর্ব তুলনা করেছেন লেখিকা,-

> "বেলা কত হলে কে জানে, কিছুক্ষণ আগেও তো শিশির পড়ছিল টুপটাপ-টুপটাপ। কাল সারারাত ঝরেছে এমনি টুপটাপ-টুপটাপ বনদুর্গা মন গড়িয়ে, স্মৃতি গড়িয়ে, বাঁশের বেড়া গলিয়ে ময়লা চট কাঁথায়ও পড়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো শিশির।"[৪]

অনেক দিন মুখে কথা নেই বনদুর্গার, শুধু মুখ নয় শরীরের সব অঙ্গই তার অচল, দু-চোখে শুধু জল কিন্তু, নিজে জল পান করতে অসমর্থ। কান পেতে বসে আছেন প্রকৃতির দিকে চেয়ে, শুধু প্রাণ ভরে তাকিয়ে থাকা নয় প্রকৃতির কোলে বিলীন হওয়ার স্বপ্ন। পাখির ডাক যেন তার মৃত্যুর আয়োজন করছে, তাকে আহ্বান করছে এবং তিনিও যেন তা অনুভব করতে পারছেন,-

> "ওদের ডানার শব্দ, গন্ধ সব অনুভব করতে পারছেন বনদুর্গা। ওদের মধ্যে কি নিয়ে যেন কথাবার্তাও চলছে"[৫]

বনদুর্গার মনে অবশ্য প্রকৃতির বোবা অবুঝ প্রাণের কাছে বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তার মনে হয়, মানুষের মনে এখন আর মানুষের প্রতি স্নেহ ও প্রেম ভালোবাসা নেই, কারণ মানুষ দিনের পর দিন নিজেকে এক একটা যন্ত্র বানিয়ে ফেলছে। তাই অন্যের দুঃখে এখন আর মানুষের দুঃখ হয় না তাই তার মনে হয়,-

> "সেবার একটা কাক বিজলির তারে লেগে মরেছিল। কয়েকশো কাক মিলে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে মমতাকে নিয়ে কি ধুন্ধুমার কাণ্ড! আর শহরের মিষ্টির দোকানে কাজ করা ভাইটাকে যখন পিষে দিয়ে গিয়েছিল একটা লরি, কেউ ভাইটার মুখে এক ফোঁটা জলও দেয়নি। আহা রে ! কত ঘন্টা পড়েছিল ভাইটা। কাক আর মানুষ। মানুষ আর কাক।"[৬]

প্রকৃতির সঙ্গে বনদুর্গার যে নিবিড় সম্পর্ক তার স্মৃতিকথায় আমাদের সামনে উঠে আসে। এই পাহাড়ের গায়ে ঘর বাঁধার পর সে একটা বাছুর রেখেছিল, যার নাম দিয়েছিল মঙ্গলা।

> "কার কাছে আছে এখন মঙ্গলা? বাচ্ছা কি দিয়েছে? আহা রে! কেমন হয়েছে বাছুরটা দেখতে?"[৭]

মঙ্গলার প্রতি বনদুর্গার যে ভালোবাসা তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎবাবুর 'মহেশ' গল্পের গফুর এবং মহেশের সম্পর্ক। তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তার মায়ের কথা, চোখের সামনে ভেসে উঠলো- ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে ফিরছেন তার মা। তখনই তার মনের স্মৃতি এবং বাইরের প্রকৃতিও যেন একাকার হয়ে গেছে,

> "ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসছে মা। কোমরে মাটির কলসি। মাথায় তিনটা অ্যালুমিনিয়ামের বটুয়া। একহাতে ভিজে কাপড়। মা চলছে, আহা রে। যেন জগৎ জননী। কোমর ছাপিয়ে লাল-লাল চুল"[৮]

এখানেই বনদুর্গা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ ও সম্পূর্ণ একাত্মবোধ অনুভব করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ চিত্র তুলে ধরেছিলেন,

"নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল-- নিশীথশীতল স্নেহ।

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে--
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে"[৯]

কথাসাহিত্যিক ঝুমুর পাণ্ডে তাঁর 'জল খাবেন বনদুর্গা' গল্পে একদিকে যেমন প্রকৃতির অপূর্ব রূপকে চিত্রায়িত করেছেন তেমনি অন্যদিকে পাখির সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আর্তিকে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,-

> "ইষ্টি কুটুম পাখিটা ডাকল। এখন তো পাখিরা ডাকে না। কোত্থেকে এল এখন এই পাখিটা। এই হলুদ রঙের পাখিটার পেছনে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কতদিন ছুটেছেন বনদুর্গা। কালীথানের ঝোপে ঘর বেঁধেছিল পাখি দুটো তখন থেকেই উঁকিঝুঁকি। তারপর ডিম। তা। মেয়ে পাখিটা তা দেয়। পুরুষটা খাবার খোঁজে। একদিন ডিম ফুটে বেড়িয়ে এল এল ফুটফুটে দুটো বাচ্চা। খাওয়ার জন্য বড় বড় হয়ে হা করে থাকত সারাক্ষণ।"[১০]

প্রকৃতি ও মানুষের এই প্রশান্তিময় কোমল স্নিগ্ধ সম্পর্কের পাশাপাশি শোষণের কঠোর রূপটিকেও গল্পকার আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন বনদুর্গার মধ্যে দিয়ে যখন তার নিজস্ব ভিটেমাটি ছেড়ে তাকে আসতে হয় এই খাসজমির ফুচুর বাবার বানিয়ে দেওয়া এই ঘরে। ঘরে ভিটের উপর দিয়ে যাওয়া রেলপথ নির্মাণ হবে বলে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মানুষদের জীবন কথা উঠে এসেছে এই গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে,-

> "ওদের বাপঠাকুরদার ভিটের পেট চিরে এখন সিটি বাজায় রেল। আম, জাম, কাঁটাল, সুপুরি, আহা রে! জলপাই, লুকলুকির গাছও ছিল। বাতাবিনেবুর গাছে লাফালাফি করত কাঠবেড়ালি। ভেবেছিল অনেক পয়সা পাবে, কত আশ্বাস দিয়েছিলেন এম.এল.এ সাহেব এসে। কিন্তু কোথায় টাকা কোথায় পয়সা? মালিক পাবে নাকি আশি শতাংশ আর ওরা বিশ- তা ও এখনও কোর্টে কেস ঝুলছে।"[১১]

শুধু আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা বা যাতায়াতের পথ নির্মাণের জন্য ভূমি সংলগ্ন মানুষের জমি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে, ভূমিহীন করে চলছে শুধু তা নয়, অন্যদিকে সমাজের ভূমি শোষণের কর্তারাও বনদুর্গার মত দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জমির উপর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। গল্পে বনদুর্গার মৃত্যুর পূর্বে তার স্বামীর উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিকানা আদায়ের জন্য বনদুর্গার কাছে ফিরে আসে। জঙ্গলে এসে বনদুর্গা সিলিংয়ের যে জমিতে চাষ করেছিল সেই জমির লোভে,-

> "তাহলে কি পাষণ্ডটা জমির লোভেই এসেছে? কী ঘেন্না কি ঘেন্না।"[১২]

মানুষের মনের এত লোভ দেখে বনদুর্গার চোখের জল শুকিয়ে যায়, তার মনে পড়ে তার বাবা ও মায়ের কথা, তার বাবা এক ব্যাগ টাকা পেয়ে থানায় ফিরিয়ে দিয়েছিল, মা মেমসাহেবের হার পেয়ে ফিরিয়ে দেয়। বনদুর্গা বাইরে কান পেতে শুনতে পায় যে, আজ কেউ তার জন্য কাঁদছে না বরং তাঁর মৃত্যুর পরে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ের জন্য সবকিছুর আয়োজন করছে,

> "না কেউ কাঁদছে না বাঁশ কাঠ কাটার শব্দ হয়তো শুরু হবে এক্ষুনি। বনদুর্গা হাসলেন হো হো করে অনেক অনেকক্ষণ...।"[১৩]

বনদুর্গার এই হাসি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে, তার আপনজন, নিজের হাতে গড়া বাড়ি-ঘর, জায়গাজমি কিংবা আরও সম্পদকে যা মৃত্যুর সময় সাথে করে নিয়ে যেতে পারে না। তাই সে বুঝতে পারে পারিবারিক বন্ধন থেকে দূরের প্রকৃতিই তার হাতের নাগালে, তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে সে অনুভব করতে পারে চোখের সামনে ওই পাহাড় অতিক্রম করলেই তার মুক্তি,-

> "বাইরে কত সুন্দর গাছ গাছালি বন জঙ্গল ফুল পাতা আহারে আকাশের কত ধোঁকা ধোঁকা মেঘ কল কল করে উড়ে যাচ্ছে জংলী হাঁসের ঝাঁক বসে আছে একটা তৃতীয় একটা কি যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে বাসস্থানের ধূপের গন্ধে বাতাস সরষে ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন ওই পাহাড়ের নিচে একটা বড়

হালকা লাগছে মনটা প্রাণ ভরে বুক ভরে শ্বাস দুর্গা কিন্তু সারা শরীর জুড়ে জুড়ে বড় বড় দেশটা পাহাড়ি ঝরনা ঝর ঝর করে ঘুরে দাঁড়ায় এখানে জল ঝড় নেমে অঞ্জলি পড়ে মনের সুখে এখন জল খাবেন বনদুর্গা"[১৪]

প্রকৃতি যেন তাকে আহ্বান করছে, আর তখনই তার কাছে মনে হয়েছে যে প্রকৃতিই মানবজাতি থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই প্রকৃতির অনুভূতি মানুষের চেয়ে যে বেশি শক্তিশালি তা এই গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

চার

পরিতোষ তালুকদার-এর **'সীমান্তের ওপারে'** গল্পের অভির চরিত্রে আমরা দেখি যে, প্রকৃতি মানুষের আবেগকে কীভাবে প্রভাবিত করে। প্রকৃতি আহ্বান জানায় অসীমের পথে। সঙ্কীর্ণতার উর্ধে যে অসীম আকাশ সুন্দর; তা দেখার আয়োজন করে প্রকৃতি। প্রাকৃতিক দৃশ্য মানব মনের আনন্দ ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগায়, যা দুঃখকে প্রশমিত করে। গল্পের মানবমন অভি তাই বার্তা দেয় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় কাটালে আমরা নতুন করে প্রাণশক্তি লাভ করি, যা আমাদের মনে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। গল্পের অভির চরিত্রে আমরা তা'ই লক্ষ করি,-

"অভির খুব ইচ্ছা ছিল ছেলে-বউমার হাতে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে সে স্বাধীন জীবনযাপন করবে। স্ত্রীকে নিয়ে মাঝেমাঝেই বাইরে ঘুরে আসবে। ঘোরা মানে বার্ধক্যের বারাণসী নয়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে দু-চোখ দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করবে। কত কিছুই তো দেখা হয়নি। নদী, পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র, রাজস্থানের মরুভূমি। কত জীবজন্তু, কতরকমের পাখি, গাছ। কত প্রত্নতত্ত্ব-হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সন্ধান করবে। আজ থেকে হাজার বছর আগে মানুষের জীবন কেমন ছিল। কীভাবে তারা বেঁচে থাকত। কী খেত-পরত, এমন কী তাদের দিনযাপনের উপায় কী ছিল? তারা কি এখানকার মানুষের থেকেও অনেক বেশি সুখী ছিল? তা হয়তো ছিল। কারণ সমাজে দগদগে ঘা ছিল না। মানুষে মানুষে বিশ্বাসের মেলবন্ধন ছিল। পৃথিবী এতটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছিল না আসলে সে সময় মানুষের চাহিদা এত বেশি ছিল না। তারা অল্পতেই খুশি হত। যতটুকু পেত সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করত। তাই কোনো আক্ষেপ ছিল না। হতাশা ছিল না।"[১৫]

অভির যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবী শব্দ আমাদের মনে করিয়ে দেয় মহীনের ঘোড়াগুলি গানের পঙক্তি- 'পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে, স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে, ড্রয়িংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দী...' । যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবীর অবক্ষয় ও প্রকৃতির ধ্বংসের প্রতি মানুষ মানবিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেলছে। পৃথিবীকে যেন মানুষ নিজের মত করে যান্ত্রিকতার কাছে বন্দী করছে। প্রাকৃতিক উপাদানের অতি ব্যবহারে ও অবহেলার ফলে পরিবেশ ক্রমশ কলুষিত হচ্ছে। বন, নদী, পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ উন্নয়ন ও আধুনিকতার নামে প্রকৃতির উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে। সত্যিই তো যে পৃথিবী একদিন শুভ্র সুন্দর ছিল। প্রকৃতির শোভা ছিল অদ্ভুত, অপরূপ স্থান। মানুষের অন্তহীন চাহিদার কারণে সেই সৌন্দর্য এখন বিলীন হতে বসেছে। অভির প্রকৃতি ও পৃথিবীকে দেখার যে দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি, বিলাসিতার দৃষ্টি নয়। এই ভাবুকের দৃষ্টি এনে দেয় সৌন্দর্য, জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টি দেয়। এই দৃষ্টি প্রশান্তির। এই চিন্তা ও ধারণা মানব মনকে সৃজনশীল করার সুযোগ দেয়, যা আমাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট সমস্যাগুলো থেকে কিছু সময়ের জন্য দূরে নিয়ে যায়। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রকৃতির সান্নিধ্য মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

পাঁচ

স্বপ্না ভট্টাচার্যের **'বাস্তুহীন'** গল্পে দেশভাগের ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে নানা অংশে ছিন্নমূল হওয়া মানুষের বোবাকান্নার অশ্রুজলসিক্ত আর্তনাদ ও করুন ভাষ্যের পরিচয় পাই আমরা। দেশভাগের ফলে স্বদেশ হারানো মানুষদের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে আসা প্রকৃতির স্মৃতিচারণ যে নতুন বেদনার

বাতাবরণ তৈরি করেছে। তা গল্পকার অসাধারণ রূপ দিয়েছেন গল্পে। দেশভাগের সময় মানুষ যে হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে ছুটেছে। স্বদেশের ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন দেশের সন্ধানে বের হতে হয়েছিল। আবার পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে প্রাণের স্পন্দন-এর মত প্রকৃতিকে ছেড়ে আসার দৃশ্যও গল্পকার এঁকেছেন প্রকৃতির সাহায্যে,-

> "সকালে নদী থেকে একটা হিমেল হাওয়া উঠে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল বাড়িময়। কুয়াশায় ঢেকে গেছে নদী। উৎপলের বাড়িতে সুদীপ ভাড়া থাকে। সুদীপ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। স্বাতী ঠাকুর নিয়ে ব্যস্ত। অনেক জিনিস এদিক সেদিক গচ্ছিত রেখে এলেও স্বাতী ঠাকুরের আসন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ভাঙা পুরোনো বাড়ি নিয়ে অবিরাম ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছে। শাপ শাপান্ত। কিন্তু বাড়ি ছাড়বে না, ছাড়বে না করেও শেষ পর্যন্ত উঠে আসতেই হলো। বাইরে পাখির কিচির-মিচির। গরাদহীন জানালা দিয়ে তাকালে নদী দেখা যায়। কুয়াশার ভেতরে আবছা নৌকো। এমন নৌকোর কি সত্যবতী খেয়া পারপার করত।"[১৬]

আজ দেশভাগের পর যারা উদ্বাস্তু শরণার্থী হয়ে বসবাস করছে নানা দেশের প্রান্তে ত্রাণশিবিরে বা রিলিফ ক্যাম্প-এ তাদের প্রত্যেকের স্মৃতি ভান্ডারে এখনও সঞ্চিত আছে স্বদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য। পূর্বপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে, বিতাড়িত করা হয়েছে আপন ভিটে মাটির স্পর্শ থেকে তা ঠিক যেমন একটা গাছকে সাজানো বাগান থেকে শেখর শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়। তেমনি পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে কত মানুষ আজ বাস্তুহীন হয়ে পড়েছে। বিভাজন আজ বিভীষিকার মতোই কাজ করছে। এই বিভাজন বিচ্ছেদ শুধু মানুষের থেকে মানুষের নয়, প্রকৃতি থেকেও বিচ্ছেদ। গল্পকার 'বাস্তুহীন' গল্পে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ছয়

তপোধীর ভট্টাচার্যের **'সেই বাড়ি'** গল্পে ফেলে আসা বাড়ির স্মৃতিতে প্রকৃতির ছবি নানা ভাবে ধরা পড়েছে। মানব মনে বাড়ির অবস্থান, তার নকশা ও পরিবেশ গভীর ছাপ ফেলে। ছায়াসুনিবিড় বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার কোণ, বা পেছনের বাগান—সবই স্মৃতির অংশ। বাড়ির চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ—গাছপালা, ফুল, পাখির গান এবং নদী বা পাহাড়—এই সবই স্মৃতিতে স্থান করে নেয়। এই দৃশ্যগুলো মানুষকে শান্তি ও প্রেরণা দেয়। গল্পে চিত্রিত এই বাড়ির ছবি আমাদের তাই মনে করিয়ে দেয়। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি যে,-

> "বাড়িটা পুরোনো। অনেকদিনের পুরোনো। তার পেছনেই সারি বেঁধে রয়েছে দিগন্তবিস্তারী পাহাড়। প্রতিটি প্রহরে রং বদলায় তার। কালো সবুজ ধূসর কপিশ। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঘন বন, সরল শাল তমাল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডালে-ডালে রং বেরঙের পাখিদের কিচির-মিচির। গ্রীষ্মের খর দুপুরেও রোদ সেখানে কোমল হয়ে থাকে। ছায়ায় বিশ্রাম করে দ্রুতগতি হরিণ ও খরগোস। মাঝে-মাঝে বনের গভীরে কাঠুরিয়া যায়, রাখালও যায়। ছায়া নিবিড় হয়ে এসে কাঠুরিয়া পা ছড়িয়ে বিরাট কোনো গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে। রাখাল হাতে তুলে নেয় বাঁশের বাঁশি, নিশ্চিন্ত সহজ ভঙ্গিতে। আমেজে চোখের পাতা খুঁজে আসে। আর বাতাসে ভাসতে ভাসতে সুর ছড়িয়ে পড়ে এখানে-ওখানে। ঝিমোতে ঝিমোতে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ায় গোরু ও মোষের দল, হরিণ ও খরগোস ভিতু চোখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ওই বনের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলার-পথ মিলিয়ে গেছে আরও গভীরে-যেখানে গাঢ় অন্ধকার, যেখানে কেউ সহজে যাওয়ার চিন্তা করে না-। বাড়ি থেকে একটা পাকদণ্ডি বেরিয়ে মিশে গেছে ওই পথে। লোকে বলে, যেখানে সূর্য ওঠে আর ডোবে, সেই চাঁদ ও তারার দেশের সীমানায় পাহাড়চূড়োয় গিয়ে হারিয়ে গেছে ওই পায়ে-চলা-পথ।"[১৭]

গল্পের চরিত্র এমনই প্রাচীনতম স্মৃতি চাষ করছে। এই স্মৃতিপট প্রাকৃতিক জগতের সুধা বিজড়িত স্থান, স্নেহের শব্দ এবং ঘ্রাণ দিয়ে আঁকা একটি ক্যানভাস। কথকের বাড়ির স্মৃতিগুলি শৈশবের উষ্ণতা এবং ভালবাসায় ভরা একটি অভয়ারণ্য। এই স্মৃতি পাঠকদের মনে করিয়ে দেয়, প্রজাপতির পিছনে ছুটতে, গাছে আরোহণ করতে এবং লুকানো পথগুলি অন্বেষণে কাটানো বিকেলের কথা। এই স্মৃতিগুলি দ্রুত গতির বিশ্বে সান্ত্বনা দেয়, আমাদের পৃথিবী এবং পরিবেশ উভয়ের সাথে আমাদের সংযোগের গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্প কথকের এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির প্রতি অসহায় মানুষের যে অফুরন্ত ভালোবাসা তা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের শেষে আমরা দেখি যে কথকের সেই প্রকৃতির কোলে থাকা বাড়ি, সেই জন্মস্থানকে ছিনিয়ে নিচ্ছে আধুনিক তথাকথিত সভত্যার জগত,-

> "বাড়িটা পুরোনো। অনেকদিনের পুরোনো। একদিন তার চত্বরে অনেক লোকজন আনাগোনা করত। হাট বসত মানুষের। শব্দের স্রোত বয়ে যেত অবিরল। এখন পাহাড়ের পায়ের কাছে বনে সরকারি জনমানুষ এসে জমি মাপছে। ধীরে ধীরে একে একে মাটিতে শুয়ে পড়ছে সরল-শাল-তমাল। কাঠুরিয়া নেই। কবে মরে গেছে। রাখাল বুড়ো। চোখে ছানি। কথা বলতে গলা কাঁপে। বাঁশের বাঁশি তাকের উপর। উই ধরেছে। রাখাল লাঠি ঠুকঠুক করে এসে মাঝে মধ্যে জমি মাপা দেখে। আরেকটা গাছ মাটিতে শোয়। শিউরে ওঠে বুড়ো। আপন মনে কী সব কথা বলে। কেউ কান দেয় না, চোখে জল, পিচুটি। তাই সব ঝাপসা হয়ে যায়। পায়ে-চলা-পথ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ট্র্যাকটর গোঁ গোঁ করছে। জমি সমান হচ্ছে। কলকারখানা হবে।"[১৮]

হয়তো পাহাড়টা সরকার লিজ দিয়েছে কোনো কোম্পানির কাছে, হয়তো এই পাহাড়ের বুক থেকে ডিনামাইট দিয়ে পাথর খুঁড়ে সে পাথর বিদেশে বিক্রি করা হবে। বন, জলাভূমি এবং অন্যান্য আবাসস্থলগুলি প্রায়ই কারখানা, রাস্তা এবং আবাসন উন্নয়নের পথ তৈরি করার জন্য পরিষ্কার হবে। শিল্পায়নের সবচেয়ে দৃশ্যমান প্রভাব নগরায়ন বা শহরীকরণ, ফলে পাহাড়ের গায়ে শহরগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটবে। প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে বাড়বে আর্থিক লাভের সংখ্যা। অর্থাৎ, পুঁজিবাদ। এই লোভের ভোগের পিছনে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় পুঁজিবাদ তার রূপ উন্মোচন করে মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। এই পুঁজিবাদ ভোগের একটি সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে যা পরিবেশগত ঐশ্বর্যের চেয়ে বস্তুগত সম্পদকে মূল্য দেয়। ভোগবাদের উপর জোর প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক শোষণের দিকে নিয়ে যায়। বিনিময়ে পরিবেশ দূষণ এবং বর্জ্য তৈরি করে যা প্রকৃতিকে কলঙ্কিত করে এবং বায়ু ও জলের গুণমানকে হ্রাস করে।

সাত

আলোচিত কথাশিল্পীদের গল্পগুলিতে একদিকে যেমন প্রকৃতির সুন্দরতা প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, প্রকৃতির ধ্বংসের চিত্রও উঠে এসেছে। যা পরিবেশের বিপর্যয় ও মানব কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ উদ্ভূত সংকটকে চিহ্নিত করে। লাগামহীন, ভোগবাদ, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, লোভ, লালসা, লম্পট, ভোগ, অধিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়েছে যা আধুনিক যুগে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের যোগসূত্রকে ক্রমশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এতে ধ্বংস হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, সামাজিক পরিচয় ও সমাজসেবার মানসিকতা। মানুষের সর্বনাশের কারণ যে মানুষ নিজেই। আধুনিক সভ্যতা তৈরি করছে আশ্চর্য পৃথিবী! যেখানে প্রকৃতি রক্ষার জন্য, সবুজ নিধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে তাঁদের চিরাচরিত অরণ্যের অধিকার থেকে। মিথ্যা স্বর্গরাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে মূল্যবোধ ধ্বংস করা হচ্ছে। এই ভোগবাদের ভোক্তারা বিশ্বাস করেন যে, এই ঈশ্বর-সৃষ্ট সুন্দর পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের ভোগের জন্য! হ্যাঁ, আজ প্রকৃতির চেয়ে মানুষই বড়, মানুষ সর্বোত্তম। কিন্তু কাল প্রকৃতির মৃত্যুতে মানুষই দায়ী থাকবে।

সূত্র নির্দেশ

১। দাশ নির্মল, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিকেশন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৯৭, পৃ: ১৫১
২। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৯, পৃ: ৭৯
৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি-৩১ সংখ্যক', ১৬ই ভাদ্র ১৩১৬, রবীন্দ্ররচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম রিফ্লেক্ট সংস্করণ- ১লা শ্রাবণ, ১৪১৩, পৃ: ২১১
৪। পাণ্ডে ঝুমুর, জল খাবেন বনদুর্গা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-ভাদ্র ১৪২০, পৃ: ২২
৫। তদেব, পৃ: ২২-২৩
৬। তদেব, পৃ: ২৩
৭। তদেব, পৃ: ২৩
৮। তদেব, পৃ: ২৪
৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন ১৯৩৮, পৃ: ১৭৩
১০। পূর্বোক্ত, জল খাবেন বনদুর্গা, পৃ: ২৪
১১। তদেব, পৃ: ২৬
১২। তদেব, পৃ: ২৭
১৩। তদেব, পৃ: ২৮
১৪। তদেব, পৃ: ২৮
১৫। পুরকায়স্থ রণবীর (সম্পাদক), আসামের বাংলা ছোটোগল্প, একুশ শতক, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১৮, পৃ: ১৮৫
১৬। তদেব, পৃ: ৩৩১
১৭। তদেব, পৃ: ১০৯
১৮। তদেব, পৃ: ১১১